ভূমিকা

এক সময়ের ইংরেজ করদমিত্র রাজ্য কোচবিহার বর্তমানে জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা মাত্র। এক সময়ে এই রাজ্যটি গুরুত্বের বিচারে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এই রাজবংশের রাজাদের বংশ পরম্পরা রাজ্যশাসন যেমন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার্য তেমনই এই অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সমাজজীবনে এই রাজবংশের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান অধ্যায়। আধুনিকতা, অগ্রসর চিন্তা কীভাবে কোচবিহারের সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তার অনুসরণ একটি সামাজিক দায়িত্ব নিঃসন্দেহে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের (১৮৬৩-১৯১১) সমকাল কোচবিহারের সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার অনুসন্ধান। এই মহারাজাদের রাজত্বকালে রাজদরবারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছিল। সেই অনুকূল পরিবেশে এক দল কর্মযোগী, মনীষী, সাহিত্যিক তাঁদের সোনালি ফসল ফলিয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শাসন-ভূমিব্যবস্থায় সার্বিকভাবে সমাজ জীবনে।

আধুনিকতার নানান অর্থ করেছেন নানা পণ্ডিত ব্যক্তি। আমরা এর মর্মার্থ গ্রহণ করেছি। সেই মর্মার্থ হচ্ছে—অগ্রসর সমাজ জীবন। যা ছিল সেখান থেকে এগিয়ে বহুজনের যুক্তি গ্রাহ্য মঙ্গলের সাধনা। বলা বাহুল্য, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এক্ষেত্রে এই রাজবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। আলোকিত এই মানুষের কর্ম সাধনা ও তার সহযোগী অগ্র পথিকদের অবদান আলোকিত হয়েছে নয়টি অধ্যায়ে।

আমাদের আলোচনার প্রথম অধ্যায়টিতে কোচবিহারের একটি সাধারণ পরিচয় তুলে ধরেছি। এই অঞ্চলটি সম্পর্কে পরিচিত না হলে আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ মনে হবে না। মাটি আর মানুষের সম্মিলিত যোগফল সমাজ-সংসার। প্রকৃতি সেই সমাজ ও সংসারকে অনেকটাই তার প্রয়োজন মতই গড়ে। এই অধ্যায়টি আলোচনার প্রবেশিকা মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে কোচবিহার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে এই রাজবংশের পত্তন থেকে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সমকাল পর্য্যন্ত মহারাজাদের কথা খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অংশটির সংযোজন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এই রাজ্যের ও রাজবংশের সঙ্গে ব্রিটিশ সংশ্রবের প্রসঙ্গটি। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিলের চুক্তিটি কোচবিহারের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিণামবাহী। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোচবিহার রাজের এই সন্ধি এই রাজ্যের স্বাধীনতার পরিপন্থী। আবার এখান থেকেই শুরু হ'ল 'আধুনিক' কোচবিহারের পথ চলা। অতীতের অনেক খোয়াড়িকে পেছনে ফেলে এই ব্রিটিশ সংশ্রব এই দেশীয় রাজ্যটিকে আধুনিকতার মানচিত্রের সঙ্গে জুড়ে দিল ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে—এইসব কথাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের ঐতিহ্য পরম্পরার পারিবারিক শাসনের পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রতিজন রাজাই তাঁদের পূর্ববর্তী রাজার তুলনায় অগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের উপর যে আলো এসে পড়েছে তার অনেকটাই বংশ পরম্পরায় অর্জিত সুফল। সমাজ বিবর্তণের ধারা বিবরণী হিসেবে এই অধ্যায়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত মানুষ মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বাল্যকাল-শিক্ষা-রাজ্যশাসন সমুদয় বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সংহতভাবে। তিনি কেমন করে আধুনিক কোচবিহারের রথের সারথি হলেন অথবা তাঁর হাত ধরে সমাজ-সাহিত্য কতটা শ্রীমণ্ডিত হ'ল, অগ্রসর হ'ল তার বিবরণ এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রভাব তৎকালীন কোচবিহারের সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিতে। সুনীতি দেবী ও মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ এক মহা সাংস্কৃতিক সমন্বয়—এক অগ্রসর সমাজের জন্য সম্মিলিত সাধনা। আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে এই মহারাণীর সহযোগী ভূমিকাটিকে। সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষরও তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে। কেশব কন্যার আগমনে, কর্মতৎপরতায় এই রাজ্যটিতে বাইরের জগতের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। ক্রমে তা শক্তি সঞ্চয় করে সমাজের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। মহারাজার সমস্ত কৃতিত্বের অর্ধেক সত্যিকারেই প্রাপ্য এই মহারাণীর।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবের ফলশ্রুতি। বিবাহসূত্রে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সমাজের অনেক গুণী মানুষও এই ধর্মমত গ্রহণ করেন। কোচবিহারে স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্ব বেড়ে যায়। ব্রাহ্মদের যুক্তিবাদী মনের কর্ষণ শুরু হয় কোচবিহারে। এই খোলা হাওয়ায় সুফল পেয়েছে তৎকালীন কোচবিহারে সমাজ ও সাহিত্য।

অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজের সহযোগী বিশিষ্ট মানুষদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন—মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর, কর্ণেল হটন ও নিরুপমা দেবী। তৎকালীন কোচবিহারের সমাজজীবনে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদানের মূল্যায়ন রয়েছে এখানে। এই অধ্যায়টি অভিনব। কারণ, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও মহারাণী সুনীতি দেবীর অগ্রসর চিন্তাকে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই বাস্তবায়িত করেছেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এঁদের প্রতিভার দান। এই সোনালি কর্মপ্রবাহের তরঙ্গে তৎকালীন কোচবিহারের জনজীবন তরঙ্গায়িত হয়েছিল।

নবম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে মূল্যায়ন। এই পথ পরিক্রমায় আমরা কী পেলাম তার বিবরণ রয়েছে এখানে। প্রকৃতপক্ষে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের কর্মবহুল রাজত্বকালের মূল্যায়ন এখনো হয়নি। আধুনিক কোচবিহারের জনক নৃপেন্দ্র নারায়ণ। কিন্তু কেন? এই বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। আজকের কোচবিহারের মর্মস্থলে রয়েছে সেই সময়—অর্থাৎ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল; তাকে ঘিরে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কর্মযজ্ঞের পরিমণ্ডল।

পরিশিষ্ট অংশে কিছু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে স্থান পেয়েছে সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্রমালা। বর্তমানের স্বার্থেই অতীতকে মনে রাখার তাগিদে এই প্রয়াস।

এই গবেষণা নিবন্ধ প্রস্তুত করতে গিয়ে অনেক বিদ্যানুরাগী মানুষের সাহায্য আমি পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার গবেষণা নির্দেশক ড. দিগ্বিজয় দে সরকার মহাশয়ের সহৃদয় সক্রিয় তত্ত্বাবধানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রয়াত ভরত চন্দ্র পাল মহাশয়ের কাছে তাঁর নিয়ত উপদেশের জন্য। শ্রী সমীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। মুদ্রণকার্যে উপযুক্ত সহযোগিতা দিয়ে স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছেন রাখী ধর। কোচবিহার সাহিত্য সভা গ্রন্থাগার, নর্থবেঙ্গল স্টেট লাইব্রেরী, রাজ্য লেখ্যাগার ও নানা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

হাজরাপাড়া
কোচবিহার

পম্পা দাস
(পম্পা দাস)